ভারতের মুসলিমদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের পুনর্বিবেচনা

হিলাল আহমেদ

১৯ ডিসেম্বর, ২০২২

সমসাময়িক ভারতের মুসলিম রাজনীতির বিষয়ে যে কোনও আলোচনাই সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়েই থাকবে, যদি *রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব* – এই শব্দের দুটি জনপ্রিয়, এবং অন্য দিকে, পরস্পরবিরোধী অর্থকে বিবেচনা না করা হয়। সাধারণত মুসলিম প্রতিনিধিত্বকে একটি স্বাভাবিক ও প্রথাগত আদর্শ বলে ইঙ্গিত করা হয়। বলা হয় যে, মুসলিম এমপি ও এমএলএদের উপযুক্ত সংখ্যায় উপস্থিতি, গণতান্ত্রিক রাজনীতির মসৃণ ও ফলপ্রদভাবে কাজ করাকে সুনিশ্চিত করে।, সংসদে এবং বিধানসভায় মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব এবং/অথবা প্রতিনিধিত্বের কম হারকে মূল্যায়ন করার রাজনৈতিক মানদণ্ড হিসেবে ভারতীয় সংবিধানের সমতাবাদী নীতির উপর এই জাতীয় বিতর্ক প্রবলভাবে নির্ভর করে।

এই গতে বাঁধা ব্যাখ্যাটি মুসলিমদের রাজনৈতিক উপস্থিতির হার নির্ধারণ করার জন্য একটি অত্যন্ত সরল পন্থা ব্যবহার করে। এই ব্যাখ্যাটি ধরেই নেয় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি সরাসরি ও দুই-তরফা সম্পর্ক উপস্থিত। তাই, যদি ভারতের সম্পূর্ণ মুসলিম জনসংখ্যাকে নির্বাচিত মুসলিম এমপি ও এমএলএদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায়, তবে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের সঠিক হারটি নিরূপণ করা যাবে। মুসলিমদের সামাজিক প্রান্তিকীকরণ ও অনগ্রসরতাকে বোঝানর জন্যও মুসলিম প্রতিনিধিত্বের এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যাটিকে ব্যবহার করা হয়। রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের একটা অংশ বলেন যে, মুসলিমদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতার পিছনে প্রধান যে কারণগুলি আছে, তার মধ্যে একটি হল মুসলিম প্রতিনিধিত্বের নিম্নহার। সাচার কমিশন রিপোর্ট (২০০৬)-এর রায়কে সামনে রেখে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয় যে, মুসলিমদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নৈতিকভাবে প্রয়োজন ও গণতান্ত্রিকভাবে কাঙ্ক্ষিত।

সমসাময়িক হিন্দুত্ব রাজনীতি, মুসলিম প্রতিনিধিত্ব শব্দটির আরেকটি জনপ্রিয় অর্থ আমাদের সামনে আনে। বিজেপি নেতারা অনেক সময়ই বলেন যে, ভারতীয় সংবিধান ধর্মকে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং, সেই ভাবে দেখলে, প্রতিনিধিত্বের মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। মুসলিমদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ধারণা তাই আইনত অসম্ভব ও রাজনৈতিকভাবে বিভেদ সৃষ্টিকর। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, *সব কা সাথ সব কা বিকাশ* – এই জনপ্রিয় স্লোগানই মুসলিমদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে স্থান দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এই দুটি জনপ্রিয় ব্যাখ্যা আমাদের প্রকাশ্য জীবনে আধিপত্য করে। এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আলোচনাগুলিও এই প্রকাশ্য বিতর্কগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই বিষয়টি নিয়ে এমন অসংখ্য নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও বই পাওয়া যায়, যা উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী সময়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক পরিচিতি কি ভাবে বিকশিত হয়েছে তার দিকে মনোযোগ না দিয়ে, এই জনপ্রিয় দাবিগুলিকে বারংবার বর্ণনা করে। কার্যত, প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনী রাজনীতি এবং নির্বাচনে প্রতিনিধিত্বের ধারণার সতত পরিবর্তনশীলতাকে এই বিতর্কগুলিতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়।

লক্ষণীয় বিষয়টি হল যে, মুসলিমরা একটি বদ্ধ-সমজাতীয় ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন না। সিএসডিএস-লোকনীতির সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং চিকিৎসার সুযোগই তাঁরা কাকে ভোট দেবেন সেই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। অবশ্যই, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের তাৎপর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে; কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করার জন্য শুধুমাত্র মুসলিম নেতাদের নির্বাচন করাই *সব সময়* কাঙ্ক্ষিত নয়। এই জটিল রায়টি – *রাজনীতিতে* মুসলিমদের উপস্থিতি যাতে থাকে তা নিয়ে মুসলিমদের উদ্বেগের বিপরীতে মুসলিম নেতাদের প্রতি মুসলিমদের উদাসীনতা – মুসলিম প্রতিনিধিত্ব নিয়ে জনপ্রিয় ও ছকে বাঁধা বিতর্ককে অতিক্রম করে যায়। ঠিক এই কারণেই, মুসলিম পরিচয়ের রাজনৈতিক নির্মাণ ও তার বহুবিধ প্রকাশ, সাংগঠনিক ভিত্তির যুক্তি, এবং মুসলিম নেতৃত্বের প্রকৃতি – এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্বকে নিয়ে চর্চা ও গবেষণা করা প্রয়োজন।

মুসলিমদের রাজনৈতিক পরিচিতি এবং প্রতিনিধিত্ব

মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক পরিচিতির ইতিহাস অত্যন্ত জটিল। ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং পৃথক নির্বাচনী এলাকা, ওয়েটেজ প্রণালী এবং অবশেষে দ্বি-দেশীয় তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে দেশভাগ/পাকিস্তানের দাবী সহ এই সংগঠনের অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি স্বাধীনতা-পরবর্তী মুসলিম রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার জন্য একটি বলিষ্ঠ ও বিতর্কিত ঐতিহাসিক পটভূমিকা নির্মাণ করেছে। এই ঐতিহাসিক লঘুকরণের প্রক্রিয়া গভীরভাবে সমস্যাজনক। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতিনিধিত্বের একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন যুক্তির উপর ভিত্তি করে ঔপনিবেশিক মুসলিম রাজনীতি গড়ে উঠেছিল। সামাজিকভাবে উচ্চশ্রেণীর ও ক্ষমতাবান মুসলিমদের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল। এই মুসলিম নেতারা দাবী করতেন যে, তাঁরা রাজনৈতিক অভিভাবক হিসেবে মুসলিম গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫১ সালের পরবর্তী সময়ের দৃশ্য একেবারেই অন্য রকম ছিল। ভারতের সংবিধান প্রতিনিধিত্বের সমানুপাতিক/সাম্প্রদায়িক গঠনের উপর নির্ভর করে নির্মিত হয় নি। একই সময়ে, পূর্ণবয়স্কদের ভোটদানের অধিকারভিত্তিক একটি সার্বজনীন প্রণালী এবং ফার্স্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট বা "বহুত্ব" ভিত্তিক ভোটদান প্রক্রিয়া একটি নতুন রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের কাঠামোর প্রতিষ্ঠা করে। ভৌগলিকভাবে চিহ্নিত একটি রাজনৈতিক নির্বাচনী এলাকায় বসবাসকারী *ভোটদাতা গোষ্ঠীর* প্রতিনিধিত্ব করার কথা ছিল নির্বাচিত এমপি ও এমএলএদের। তাঁদের দায়িত্ব ছিল, *সমর্পিত বার্তাবাহক* হিসেবে এই ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা ও দাবীর প্রতিনিধিত্ব করা। এর অর্থ এই নয় যে, ভারতের সংবিধান গোষ্ঠীর অধিকারের প্রতি উদাসীন ছিল; ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে সমঝোতা না করেই এই দেশের সংবিধান গোষ্ঠীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে, তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি), এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত কয়েকটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করা হয়েছিল যেগুলির সাহায্যে গোষ্ঠীভিত্তিক সমষ্টিগত আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। এই পরিকাঠামোতে প্রথাগত মুসলিম রাজনীতির কোনও স্থান নেই। দেশের রাজনীতি আধিপত্যময় জীবনে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিনিধিত্বের একটি নতুন অর্থ মুসলিম নেতাদের তৈরি করে নিতে হয়েছিল। এই রকম একটি অস্থির পটভূমিতেই মুসলিম গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক অংশীদার হিসেবে পুনর্সংজ্ঞায়িত করা হয়।

সমসাময়িক মুসলিম রাজনৈতিক পরিচয়ের দুটি পরস্পরবিরোধী দিককে চিহ্নিত করার জন্য এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি প্রয়োজন। এক দিকে এমন অনেক সাংস্কৃতিক বৈচিত্রপূর্ণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠী আছে যাঁরা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই মুসলিম গোষ্ঠীগুলি জাতি, শ্রেণী, ধর্ম ও এমনকি, ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী বিভাজিত। আপাতদৃষ্টিতে সমজাতীয় মুসলিম গোষ্ঠী নির্বাচন প্রণালীর সঙ্গে

নানা ভাবে জড়িত থাকে এবং যাকে *স্বতন্ত্র ও বাস্তব মুসলিমত্ব* বলা যেতে পারে তা নির্মাণ করে। এই বিষয়টিকে বোঝানর জন্য নির্বাচনী এলাকার স্তরে মুসলিমদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘটনাটি সব চেয়ে ভাল উদাহরণ।

এর অর্থ এই নয় যে, এই অতিশয় বৈচিত্রপূর্ণ মুসলিম গোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত অথবা, সমষ্টিগতভাবে নিজেদের "ভারতীয় মুসলিম" বলে মনে করেন। সমষ্টিগত মুসলিম পরিচয় দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পন্থার মাধ্যমে নির্মিত হয়। হয় *ধর্মীয় সংখ্যালঘু* হিসেবে মুসলিমদের আইনসঙ্গত অবস্থানকে বৈধতা দিতে, নয় জাতীয়তাবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে তাঁদের খারিজ করতে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা মুসলিমদের একটি সমজাতীয় গোষ্ঠী হিসেবেই দেখেন। দুই ক্ষেত্রেই মুসলিমদের একটি সমজাতীয় সমষ্টি হিসেবে দেখা হয়। এই অর্পিত অখণ্ডতা মুসলিম গোষ্ঠীর আত্মোপলব্ধিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। তাঁরা নিজেদের একটি সর্বভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে কল্পনা করেন। এই প্রক্রিয়াটির ফলশ্রুতি হল *মুসলিমত্ব বিষয়ে আলোচনা,* যা মুসলিম গোষ্ঠীর অধিকার, সুবিধা, দায়িত্ব, কাজকর্ম এবং সমষ্টিগত ক্লেশকে কেন্দ্র করে চালিত হয়।

স্বতন্ত্র ও বাস্তব মুসলিমত্ব (বৈচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে) ও *মুসলিমত্ব বিষয়ে আলোচনা* (সমজাতীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে)-র মধ্যে রাজনৈতিক বিনিময়ই আদতে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রকৃতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ধারিত করে। যেমন, আসাউদ্দীন ওয়াইসি একজন মুসলিম নেতা হিসেবে মিডিয়া-নিয়ন্ত্রিত বিতর্কের পরিসরে নিজের একটি জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন। দেশের সমস্ত অংশেই বিশাল সংখ্যক মুসলিম তাঁর জনসভা এবং প্রকাশ্য অধিবেশনগুলি অংশগ্রহণ করে থাকেন। তবে, এই পরিমাণের জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও, ওয়াইসির দল, দি অল ইন্ডিয়া ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) এখনও পর্যন্ত এই প্রবল মুসলিম উদ্দীপনাকে নির্বাচনী ফায়দায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয় নি। মুসলিমরা নির্বাচনী স্তরে এআইএমআইএমকে যে প্রত্যাখ্যান করেছেন তার কারণ এই দলের ধর্মীয় আবেদন সব সময় নির্বাচনী স্তরে জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক হিসেবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় না। অন্যভাবে বলতে গেলে, যখন ওয়াইসি মুসলিমত্বের আলোচনার প্রেক্ষিতে কাজ করেন তখন তিনি সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু হায়দ্রাবাদের বাইরের নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিতে (বা যে সমস্ত জায়গায় তাঁর দলের সঙ্গে ভোটারদের কোনও রকম সহজাত যোগাযোগ নেই) তিনি একজন অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিত্ব হিসেবেই রয়ে গেছেন। এর অর্থ, স্বতন্ত্র ও বাস্তব মুসলিমত্ব আসলে প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পরিপ্রেক্ষিত-নির্ভর যুক্তির নির্মাণ করে।

প্রতিনিধিত্ব এবং সাংগঠনিক পরিকাঠামো

যে সাংগঠনিক কাঠামোগুলি প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনী রাজনীতির প্রয়োগমূলক দিকটিকে নিয়ন্ত্রণ করে তার সঙ্গে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের রাজনীতি অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত। লোকসভা ও বিধানসভায় পূর্ণবয়স্কদের ভোটাধিকারের সার্বজনীন প্রণালীর উপর ভিত্তি করে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি আদতে রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোটদাতাদের মধ্যে *জয়লাভে সাহায্যকারী রূপরেখা* গড়ে তুলতে উৎসাহ দেয়। মোদী-পূর্ববর্তী গুজরাটের কেএইচএএম (ক্ষত্রিয়, হরিজন, আদিবাসী, মুসলিম) নকশা, এবং বাবরি মসজিদ-পরবর্তী সময়ে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের এমওয়াই (মুসলিম-যাদব) নকশার মত বিষয়গুলি এই ধরনের ভোটদানকারী গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক জোটবদ্ধতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গত আট বছর ধরে একটি প্রবল প্রতাপশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই রূপরেখারগুলির কাঠামো একেবারেই ভেঙে পড়েছে। এই দলটির ঝোঁক এমন একটি কাঠামো তৈরির দিকে যা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করে না। বর্তমানের নির্বাচনকেন্দ্রিক

রাজনীতির সর্বাপেক্ষা গুরুতর দিকগুলির মধ্যে একটি হল জয়লাভে সাহয্য করে এমন রূপরেখার কাঠামো থেকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেওয়া।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদের সদস্যরা সরাসরি নির্বাচিত হন না। এই আইন প্রণয়ণকারী সংগঠনগুলি রাজনৈতিক দলগুলিকে, তাদের পছন্দের মুসলিম নেতাকে সংসদ ও রাজ্যের বিধান সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষিক্ত করার জন্য আহ্বান জানায়। রাজনৈতিক শ্রেণীগুলি ব্যাপকতর অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রতিশ্রুতিকে পালন করার জন্য নির্বাচনের এই *পরোক্ষ* উপায়কে ব্যবহার করে থাকে। "মুসলিম রিপ্রেজেন্টেশান ইন রাজ্য সভাঃ ফর্মস অ্যান্ড ট্র্যাজেক্টরিজ" নামে ২০১৫ সালের আমার একটি গবেষণাতে দেখা যায় যে, রাজ্যসভায় মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব সব সময়ই লোকসভার থেকে অনেকটাই বেশি ছিল (৯-১০ শতাংশ)। এই তথ্যটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এর থেকে বোঝা যায় যে, এমনকি এমপি আর এমএলএদের ক্ষেত্রেও, মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব আসলে আইনসভাগুলির সাংগঠনিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল।

প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব

যাই হোক না কেন, মুসলিম প্রতিনিধিত্ব আসলে পুরোটাই নেতৃস্থানীয়দের কাজকর্মের উপর নির্ভরশীল। "পলিটিকস অ্যান্ড সোসাইটি বিটুইন ইলেকশানস" নামের ২০১৭-১৯ সিএসডিএস লোকনীতি-এপিইউ দ্বারা পরিচালিত তিন দফার সমীক্ষাভিত্তিক গবেষণাটি চব্বিশটি রাজ্যকে নিয়ে কাজ করেছে এবং আটচল্লিশ হাজারের বেশি উত্তরদাতাসহ জাতীয় স্তরের প্রতিনিধিমূলক নমুনা এই গবেষণাটি সংগ্রহ করেছে।

এই গবেষণার কটি বিশেষ প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলঃ "ধরা যাক একই রাজনৈতিক দলে এমন দুজন নেতা আছেন, যাঁরা উভয়েই আপনার সমস্যার সমাধানের জন্য সমানভাবে উপযুক্ত। যদি তাঁদের মধ্যে একজন আপনার নিজের ধর্মে বিশ্বাস করেন এবং অপরজন অন্য কোন ধর্মে, তবে এঁদের মধ্যে কার সঙ্গে আপনি প্রথমে যোগাযোগ করতে চাইবেন?"

সারণী ১: মুসলিম গোষ্ঠী এবং মুসলিম নেতা

	একই ধর্মাবলম্বী নেতা	অন্য ধর্মাবলম্বী নেতা	কোনও পার্থক্য তৈরি করবে না	জানি না
১: হিন্দু	৪৭	৬	৩৭	১০
২: মুসলিম	৪৬	৫	৪১	৮
৩: খৃস্টান	৫৮	৩	২৭	১২
৪: শিখ	৩৯	৫	৫১	৬
মোট	৪৮	৬	৩৭	১০

(উৎসঃ লোকনীতি-এপিইউ গবেষণা। সংখ্যাগুলি শতকরা হারে এবং ২০১৬-২০১৯ সালের তিনটি দফার উপর ভিত্তি করে দেখান হয়েছে। *অন্যান্য ধর্মকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।

সারণী ১ এই প্রশ্নের মিশ্র প্রতিক্রিয়াগুলিকে দেখাচ্ছে। মনে হয় যে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি যে বাধ্যতামূলক ভাবে নিজের গোষ্ঠী থেকে উঠে আসা নেতাকে বিশ্বাস করছেন এমন নয়। এ বিষয়ে মুসলিমদের উপলব্ধিও এই সাধারণ ছাঁদটিকেই নিশ্চিত করে। ছেচল্লিশ শতাংশ মুসলিম উত্তরদাতা দাবী করেছেন যে, তাঁরা প্রয়োজনের সময় তাঁদের নিজের ধর্মে বিশ্বাস করেন যে নেতা, তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ করবেন। তবে, প্রায় সমান সংখ্যক মুসলিম (একচল্লিশ শতাংশ) আবার তা বলেন নি। তাঁদের মতে নেতার ধর্মবিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই ফলাফল থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে প্রাত্যহিক মোকাবিলার জন্য নির্বাচিত মুসলিম নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি যে প্রয়োজন তা মুসলিম জনগোষ্ঠী স্পষ্টতই স্বীকার করেন। দ্বিতীয়ত, মুসলিম নেতাদের সব সময় মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা হয় না। তার বদলে, তাঁদের এমন পেশাদার রাজনীতিবিদ হিসেবে ধরা হয়, যাঁরা নিজেদের কায়েমী স্বার্থের সুবিধা আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন।

এই প্রবণতাগুলিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে যে, মুসলিম নেতৃত্বের ধারণাটি নিজে, এবং প্রকৃতিগতভাবে, একটি অতীব বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনা। তিনটি বিশেষ ধরনের মুসলিম নেতা আছেন, যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করে থাকেনঃ *পেশাদার মুসলিম রাজনীতিবিদ, সামাজিকভাবে উচ্চশ্রেণীর মুসলিম* এবং *মুসলিম প্রভাবক*। পেশাদার মুসলিম রাজনীতিবিদের দায়িত্ব হল রাজনৈতিক দল ও যে বিশেষ মুসলিম গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন বলে তিনি দাবী করেন, তাদের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র হিসেবে কাজ করা। সামাজিকভাবে উচ্চশ্রেণীর মুসলিম ব্যক্তিত্ব, অন্যদিকে, *শৃঙ্খলা আনয়নকারী* হিসেবে কাজ করেন, অর্থাৎ হয় তাঁরা বৈধতালাভের জন্য আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার কাঠামোর স্বার্থরক্ষার জন্য তাকে টিঁকিয়ে রাখেন অথবা এই কাঠামোকে প্রশ্ন করেন। প্রভাবকের কাজ মিডিয়া-নিয়ন্ত্রিত সর্বসাধারণের কথোপকথনে নিজের উপস্থিতিকে জাহির করা। এই তিন শ্রেণীর নেতাই বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ করে থাকেন এবং মুসলিম প্রতিনিধিত্বের অত্যন্ত বাস্তব ও প্রাত্যাহিক ব্যাখ্যা নির্মাণ করেন, যা সেই বিষয় সম্পর্কে যাবতীয় জনপ্রিয় ধারণা ও মিডিয়াতে প্রচলিত বিতর্কের থেকে ভীষণভাবেই আলাদা।

হিলাল আহমেদ ভারতের নতুন দিল্লির সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ডেভেলপিং সোসাইটিজ (সিএসডিএস)-এর একজন অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক।